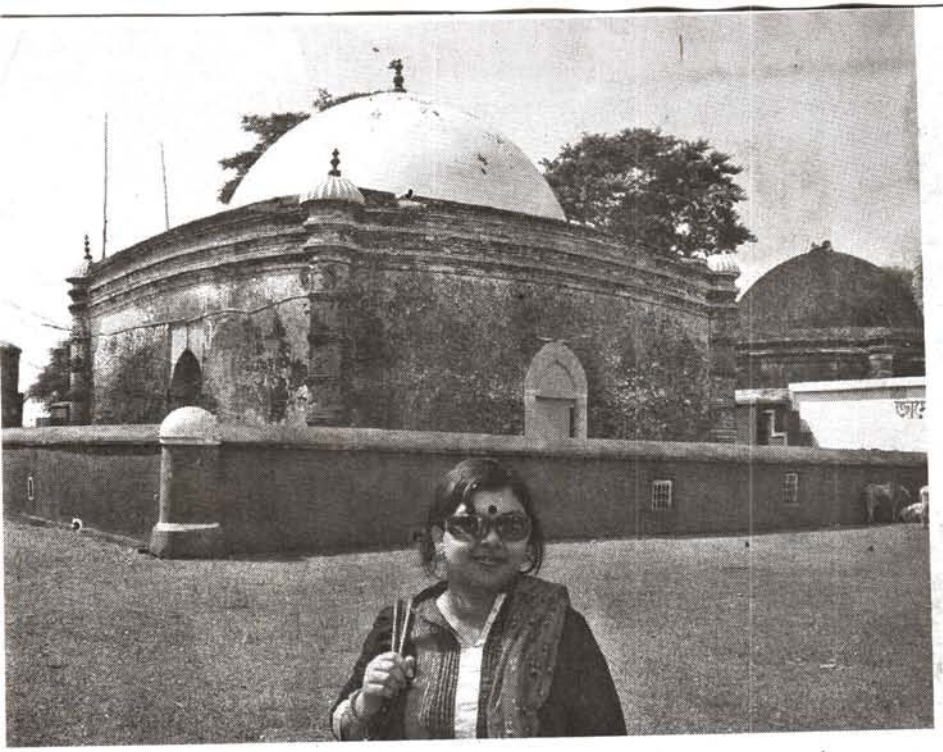

সৌন্দর্যের হাট বাগেরহাটে

● লীনা ফেরদৌস

এই তো কিছুকাল আগের কথা। মনটা কেন জানি খুব অস্থির ছিল। এই শহরের যান্ত্রিক কোলাহল, কালো ধোঁয়া আর বাক্সবন্দি একঘেয়ে জীবনে যেন হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম। একদিন বাবার কাছে কথাটা পাড়তেই নিমেষেই প্ল্যান হয়ে গেল তিনদিনের ছুটিতে বাগেরহাট ভ্রমণ। বাগেরহাট আমার পূর্বপুরুষের আবাসভূমি। বাবা চেয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষদের শেকড়ের সঙ্গে তার উত্তরাধিকারদের পরিচয় করিয়ে দিতে।

আমরা জানি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় গাবতলী বাসস্ট্যান্ড থেকে ঈগল, সোহাগ, হানিফ, দিগন্ত, দ্রুতি, সৌখিন, বিআরটিসিসহ আরো কিছু পরিবহন বাসে ৩০০ থেকে ৫৫০ টাকার মধ্যে বাগেরহাট যাওয়া যায়। আবার নদীপথেও পিরোজপুরের হুলারহাট অথবা মংলা হয়ে বাগেরহাটে যাওয়া যায়। আমরা ঠিক করলাম পুরো খান্দান একসঙ্গে যাব, তাই দুটি মাইক্রোবাস ভাড়া করলাম।

যথাসময়ে আমরা পরিবারের সবাই রওনা দিলাম। মেঘলা সকাল দেখে আমাদের মনটা মেঘলা হয়ে গেল। গাড়ি ছাড়তেই দেখি টিপটিপ বৃষ্টি, একটু পর বেশ জোরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হতেই আমাদের মনটা নিমিষে চাঙ্গা হয়ে গেল। গাড়ির গায়ে বৃষ্টি পড়ার রিমঝিম শব্দ, দুপাশে সবুজ সতেজ ভেজা প্রকৃতি, আর আমাদের ভাই, বোন, ভাবী, ভাতিজা, ভাতিজিদের খুনসুটি সব মিলিয়ে অসাধারণ অনুভূতি। আমরা খুনসুটি করছিলাম বাগেরহাট নামটা নিয়ে। সবাই বলছিলাম হয়তো কখনো এখানে সুন্দরবনের বাঘেরহাট বসত, তাই হয়তো নামটা এমন অদ্ভুত। প্রায় ৭-৮ ঘণ্টার মধে। আমরা পৌছে গেলাম প্রত্নতাত্ত্বিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আর আমাদের পূর্বপুরুষের আবাসভূমি বাগেরহাটে।

বাবা বলছিলেন, 'সুলতান নাসিরউদ্দিন শাহের (১৪৩৫-৫৯) আমলে খান আল-আজম উলুগ খানজাহান বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে খলিফাবাদ রাজ্য গড়ে তোলেন, সেই মধ্যযুগের ওয়েল ফেয়ার রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত খলিফাবাদ বর্তমানের বাগেরহাট। মসজিদ সমৃদ্ধ এই শহরটি একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনের এবং মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শনের স্বাক্ষর বহন করে। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের অনেক নিদর্শন পেয়েছেন ইতিহাসবিদরা।

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের নামাঙ্কিত মুদ্রাও উদ্ধার হয়েছে বাগেরহাটের মাটির নিচ থেকে। শোনা যায় খানজাহান আলী প্রায় একশর ওপর মসজিদ এবং সাধারণ মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে অনেক রাস্তাও তৈরি করেছিলেন। এই রাস্তাগুলোকে সেই আমলে জাঙ্গাল বলা হতো।'

বাগেরহাটে পৌঁছে আমরা সোজা গিয়ে উঠলাম আমাদের এক আত্মীয়র বাসায়। এই শহরে থাকার জন্য বাসস্ট্যান্ড, খানজাহান আলীর দরগা, ষাটগম্বুজ মসজিদের আশপাশে এবং শহরের প্রাণকেন্দ্রে কিছু আবাসিক হোটেল রয়েছে। এছাড়াও আগে থেকে ব্যবস্থা করে এলে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের রেস্টহাউসেও থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

দুপুরে অনেক মজা করে খেলাম নারকেল দুধে রান্না করা বড় বাগদা চিংড়ি, হাঁসের মাংস, সেমাই পিঠা আর সন্দেশ। নারকেল দুধের তরকারি এই অঞ্চলের ঐতিহ্য। বাগেরহাটের ডাবের পানি এবং নারকেল সত্যি অসাধারণ।

বিকেলে চলে গেলাম ষাটগম্বুজ এবং ঘোড়াদীঘি দেখতে। লাল ইটের তৈরি ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশে নির্মিত প্রাচীন আমলের মসজিদগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং এই মসজিদটি খানজাহানের অমরকীর্তি। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন এ মসজিদটিকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে মর্যাদা দেয়। মসজিদটি বাগেরহাট শহরকে বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী শহরের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে। মসজিদের পাশের একটা বড় টিনের বোর্ডে ষাটগম্বুজ মসজিদের ইতিহাস লেখা আছে। এই মসজিদটি বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলা বাগেরহাট শহর থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কের উত্তর পাশে ষাটগম্বুজ বাসস্টপেজ লাগোয়া সুন্দরঘোনা গ্রামে অবস্থিত ষাটগম্বুজ মসজিদটির মনোমুগ্ধকর নির্মাণশৈলী মুসলিম স্থাপত্যকলার এক অনন্য নিদর্শন।

শোনা যায় দিল্লির দক্ষ কারিগর দ্বারাই এই অপূর্ব গম্বুজ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এতে ব্যবহৃত পাথর বহু দূরদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়। মসজিদটির নাম ষাটগম্বুজ (৬০ গম্বুজ) মসজিদ হলেও এখানে গম্বুজ মোটেও ৬০টি নয়, ১১টি সারিতে মোট ৭৭টি গম্বুজ। মসজিদের ভেতরে ৬০টি স্তম্ভ বা পিলার আছে। পাথরের বড় বড় টুকরো দিয়ে স্তম্ভগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের প্রবেশপথটি, ভেতরের সবুজ লন, ফুলের বাগান বেশ আকর্ষণীয়। ষাটগম্বুজ মসজিদের দক্ষিণ পাশে এক গম্বুজবিশিষ্ট সিঙ্গাইর মসজিদ।

খানজাহান (রহ.) এখানে সর্বপ্রথম যে দীঘিটি খনন করেন তার নাম ঘোড়াদীঘি। এর দৈর্ঘ্য ৫শ গজ প্রস্থ ৩শ গজ। এ অঞ্চলে মিষ্টি পানির অভাবের কারণে তিনি এই দীঘি খনন করেন। কেউ কেউ বলেন, খানজাহান আলীর ঘোড়া এক দৌড়ে যদ্দুর গিয়েছিল, তদ্দুর পূর্ব-পশ্চিম লম্বা দীর্ঘ করে এই দীঘি। ষাটগম্বুজ মসজিদের সবচেয়ে কাছে হওয়ায় ঘোড়াদীঘি 'ষাটগম্বুজের দীঘি' নামেও পরিচিত। ঘোড়াদীঘি জুড়ে ফুটে আছে রঙিন শাপলা ফুল। ঘোড়াদীঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত বিবি বেগুনির মসজিদটির নির্মাণশৈলী খুবই চমৎকার।

ষাটগম্বুজ মসজিদের সঙ্গেই রয়েছে বাগেরহাট জাদুঘর। খানজাহান (রহ.)-এর ব্যবহৃত বিভিন্ন তৈজস– যেমন কষ্টিপাথরের থালাবাটি ও গ্লাস, শ্বেতপাথরের শিল ও নোড়া, বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত জিনিসপত্র প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে। প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে, শুধু রোববার পুরো দিন এবং সোমবার দিনের প্রথমভাগ বন্ধ থাকে।

পরদিন দেখলাম হজরত খানজাহান

(রহ.)-এর মাজার শরিফ। সুন্দর এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারতটি। এর স্থাপত্যশিল্প অনেকটাই ষাটগম্বুজের মতো। খানজাহান (রহ.)-এর নির্মিত মসজিদগুলোর মতো তার মাজার ভবনের চারকোণেও রয়েছে চারটি গোলাকার স্তম্ভ। মাজার ভবনের ভেতরে ধূসর বর্ণের পাথর দিয়ে আবৃত করা রয়েছে হজরত খানজাহান (রহ.)-এর কবর। মাজার ভবনের দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে ৩টি দরজা। মাজারের নিচের দিকটি পাথরে নির্মিত। কবরের আচ্ছাদনটি তৈরিতে ব্যবহৃত পাথরে চমৎকার আরবি ও ফারসি ভাষায় কালিমা, মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম, খেলাফায়ে রাশেদিনের নাম, কোরআন শরিফের আয়াত এবং খান-ই-জাহানের উপদেশাবলিসহ মৃত্যু ও দাফনের তারিখের ক্যালিগ্রাফি রয়েছে। সমাধিসৌধের বাইরে রয়েছে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বিশাল মসজিদ। এই মসজিদে তিনি জুমার নামাজ পড়তেন এবং বিচারকাজ করতেন।

প্রতি বছর চৈত্র মাসের পূর্ণিমার সময় খানজাহান আলীর মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয় এবং লক্ষাধিক লোক তাতে সমবেত হয় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ভালবাসায়। খানজাহান আলী (রহ.) সমাধিসৌধের আরেক বড় কীর্তি, বিশাল এক দীঘি– খাঞ্জেলি দীঘি। এ দীঘি তার মাজারের সামনে অবস্থিত। তিনি যে ৩৬০টি দীঘি খনন করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ এই দীঘিটি প্রায় ৪০ একর জমিতে খনন করা হয়েছিল। এই দীঘিতে কালাপাহাড় ও ধলাপাহাড় নামে কয়েকটি কুমির আছে। এ দীঘির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এই কুমিরগুলো। ভক্তদের দেখানোর জন্য মাজারের খাদেমরা মাঝেমধ্যে সেগুলোকে তীরে ডেকে আনেন। শুধু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ভক্ত তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য মুরগি নিয়ে আসে দীঘির কুমিরগুলোকে খাওয়ানোর জন্য।

খাঞ্জেলি দীঘির পশ্চিম পাশে নয় গম্বুজবিশিষ্ট নয়গম্বুজ মসজিদ। এরপর গেলাম দশগম্বুজ মসজিদে। খানজাহান (রহ.)-এর আমলে নির্মিত দশগম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ। এছাড়া রয়েছে খানজাহান (রহ.)-এর আমলে খোদিত পচাদীঘি, তার পরিত্যক্ত বসতভিটা। আরো দেখলাম চুনাখোলা গ্রামে অবস্থিত চুনাখোলা মসজিদ, রথবিজয়পুর গ্রামে সবচেয়ে বড় এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ, অযোধ্যা গ্রামে অবস্থিত সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত একটি অনিন্দ্যসুন্দর অযোধ্যা মঠ, ব্রিটিশ আমলের হিন্দু জমিদারদের প্রাচীন জমিদারবাড়ী, বাগেরহাট সদর উপজেলার রণজিতপুর গ্রামে অবস্থিত তাজমহলসদৃশ্য 'চন্দ্রমহল', ঠাণ্ডাপীরের মাজার, পাগলপীরের মাজার, জিন্দাপীরের মাজার, আবু তাহেরের মাজার, চিল্লাখানা মাজার, রেজা খোদা মসজিদ, খানজাহানের বসতভিটা ঢিবি, কোদলা মঠ, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শহীদ কৃষক রহিমুল্লাহর বাড়ি, মোড়েলের স্মৃতিসৌধ, চিলা চার্চ, কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সমাধি, নীল সরোবর, জমিদার শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের বসতবাটির আঙ্গিনায় অবস্থিত নাট মন্দির, স্বর্ণে নির্মিত প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো কৃষ্ণমূর্তি, গোপাল জিউর মন্দির, লাউপালা, যাত্রাপুর, জোড়া শিবমন্দির, ব্রিটিশ সেনাদের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীমের পিত্রালয়ের বাড়ি, রূপসা সেতু ইত্যাদি। এসব পুরাকীর্তি ঘুরে দেখানোর জন্য খানজাহান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন সহযোগিতা করে থাকে। যোগাযোগ করতে পারেন আরিফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, ফোন নম্বর ০১৭১১-১২০৯৯০।

যদি কেউ 'রথ দেখা কলা বেচা' দুটোই সারতে চান তবে আরো দুদিন সময় বাড়িয়ে বাড়তি পাওনা হিসেবে ঘুরে আসতে পারেন মংলাপোর্ট, দুবলার চর, কটকা, কচিখালি এবং সুন্দরবন। আমার বাবার সঙ্গে এটাই ছিল আমাদের শেষ ভ্রমণ। এর কয়েক মাস পরে বাবা চলে গেলেন না ফেরার দেশে। আর সে কারণেই এই ভ্রমণটা আমাদের জন্য খুব বেশি স্মৃতিময় হয়ে রইল। ■

নিজের মনের মধ্যে একটা ভুবন তৈরি করুন যে ভুবনে অল্পপ্রাপ্তিতে অসীম তৃপ্তি

সুন্দর মুখের জয় নাকি সর্বত্র। কিন্তু সুন্দর মুখ মানেই সুন্দর মন নয়। একজন মানুষের গায়ের রঙ বা চেহারা যা-ই হোক, সে যদি সুন্দর মনের অধিকারী হয়, তাহলেই সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। মনকে কীভাবে সুন্দর রাখবেন তার জন্য এখানে কিছু টিপস দেয়া হলো :

◆ **আনন্দকে সঙ্গী করুন :** প্রতিটি মানুষেরই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আর এই বেঁচে থাকার মূল কথা হচ্ছে আনন্দ। এই আনন্দকে জীবনে সঙ্গী করে নিন। পার্টি, শপিং, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, বেড়াতে যাওয়া– এসবের মধ্যে আপনি আনন্দ খুঁজে পেতে পারেন।

◆ **অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জন করুন :** অনেকে জীবনে বড় হতে গিয়ে এত বেশি যান্ত্রিক জীবনে জড়িয়ে পড়েন যে, জীবনের নির্মল আনন্দটুকু হারিয়ে ফেলেন। সব মানুষকে পেছনে ফেলে পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে তরতরিয়ে উপরে ওঠার কোনো মানে জীবনে সত্যিই আছে কি? আর সবাই কি পারে ওপরে উঠতে? যদি না-ই পারেন তাহলে মিছে কেন ও-পথে শান্তি খুঁজতে যাবেন। নিজের মনের মধ্যে একটা ভুবন তৈরি করুন, যে ভুবনে অল্পপ্রাপ্তিতে অসীম তৃপ্তি।

◆ **মানুষকে বিশ্বাস করুন :** হয়তো বিভিন্ন মানুষ আপনাকে বিভিন্নভাবে ঠকিয়েছে। নতুন করে তাই কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই বলে সব মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস উঠিয়ে নেয়া ঠিক নয়। মানুষ কেন মানুষকে ঠকায়, তা একবার বড় মন নিয়ে ভাবুন। আর একটু গভীরে গিয়ে এটাও ভাবতে পারেন, যে ঈশ্বরকে দিন-রাত খুঁজে ফিরছেন তার অবস্থান তো এই মানুষের মধ্যেই। এভাবে ভাবলেই সমস্যা অনেকটা কেটে যাবে।

◆ **পরচর্চা নয় :** পরচর্চা করে সময় নষ্ট করবেন না। যতই সুন্দর হোন না কেন, পরচর্চা করলে আপনার স্নিগ্ধতার ঘাটতি থাকবেই। এমন স্বভাব যার, সাহারা মরুভূমির রুক্ষতা তার মন-মুখ জুড়ে বসবেই। সুতরাং এড়িয়ে চলুন এই বদভ্যাস।

◆ **বিরত থাকুন প্রতিযোগিতা থেকে :** অমুকের বাড়ি-গাড়ি আছে আমার নেই কেন– এমন প্রতিযোগিতায় কখনই নামবেন না। টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি, ক্যারিয়ার নিয়ে অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করবেন না। চেষ্টা করলে হয়তো এই প্রতিযোগিতায় আপনি ঠিকই জিততে পারবেন কিন্তু আপনার সুন্দর মনটা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ প্রতিযোগিতার মনোভাব মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে।

◆ **অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ুন :** একজন মহাপুরুষ বলেছিলেন, এই পৃথিবীতে আমার একটাই কাজ, তা হলো মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়া। তাহলে আপনিইবা পিছিয়ে থাকবেন কেন? নিজের কাছে প্রশ্ন করুন, এ পৃথিবীতে কেন এসেছি, কেনইবা কারো জন্য কিছু না করেই এভাবে ঝরে যাব? এ ভাবনা থেকে মনে যে বোধের সৃষ্টি হবে, তারপরও কি মানুষকে ভালো না বেসে পারবেন? আর এই ভালবাসা বোধের জন্ম হলেই তো অন্যের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের সীমারেখা আবিষ্কার হয়ে যাবে।

মুখ হলো মনের আয়না। আর এই মন যতটা ভালো থাকবে, মনকে যতটা জটিলতা এবং কুটিলতামুক্ত রাখতে পারবেন, ততই আপনি ঝলমল করে উঠবেন।

● **নাসিমা হোসেন**